গ্রন্থ পর্যালোচনা

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন ১৯৭১-২০১৩, তপন পালিত, বাংলা একাডেমি, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ৫৯১, মূল্য: ৮০০/-

মামুন সিদ্দিক*

সাধারণত মানবসমাজের জন্য গুরুত্ববহ ও স্মরণীয় কোনো ঘটনাই ইতিহাস। সাম্প্রতিক ঘটনাকে ইতিহাস হিসেবে ধরে নিতে অনেক সময় দেখা যায় না। অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাই তো পুরোনো হয়। একসময়ে অতীত ও দূরবর্তী বিষয় ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা করা যেত না। এখন যুগ পাল্টেছে, ধারাও বদলেছে। এখন সাম্প্রতিক, এমনকী আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিষয় নিয়ে উচ্চতর গবেষণা সম্পন্ন হচ্ছে। তপন পালিত প্রণীত এমফিল অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত রূপ 'মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন ১৯৭১-২০১৩' সমকালীন ইতিহাসের গবেষণা গ্রন্থ।

অবশ্য ঘটনা পুরোনো না হলে তার সঙ্গে আবেগ লেগে থাকে। সময়ের সাথে সাথে তার বহুমাত্রিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ধরা পড়ে রাষ্ট্র ও সমাজে। কিন্তু তাও ঠিক যে, সময় চলে গেলে অনেক সময় গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ হয়ে ওঠে দুষ্কর। গবেষক যদি উপকরণের প্রাচুর্য ও বিবেচনার ঔদার্য নিয়ে মূল্যায়নে প্রয়াসী হন, সেখানে বস্তুনিষ্ঠতা থাকার কথা। তাই সাম্প্রতিক ইতিহাস ও ইতিহাস-চর্চায় বস্তুনিষ্ঠতা থাকবে না, তা নয়। আবেগও থাকতে পারে। ঐতিহাসিক কি সেই আবেগকে খারিজ করতে পারেন? পারেন না। কেন? সেটি সমাজস্থিত সত্য। আর সমাজের একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন ঐতিহাসিক হিসেবে তো বটেই তিনিও সেই বলয়ের বাসিন্দা। তাহলে তিনি কী করে সেখান থেকে মুক্ত হবেন? এটি অবশ্য নির্ভর করে ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যাক্তিক মনোভঙ্গির ওপর। ঐতিহাসিক ই এইচ কার যেমন বলেন, ইতিহাস হচ্ছে তাই, যা ঘটেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর ও দালালদের হাতে গণহত্যা-নির্যাতনের র শিকার হয়েছে ৩০ লক্ষ মানুষ। নির্যাতিত হয়েছে অসংখ্য জায়া-জননী। কবি সিকান্দার আবু জাফর তখন কবিতা লিখেছিলেন, 'গ্রামে গ্রামে আজ বধ্যভূমি'। কবি শামসুর রাহমান কবিতায় আবেগমথিতভাবে লিখেছিলেন, 'অভিশাপ দিচ্ছি।' গণহত্যার শিকার নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষ ছাড়াও ছিলো ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথমত বুদ্ধিজীবী হত্যা, একই সঙ্গে গণহত্যার বিচারের দাবি ওঠে। ক্রমে সে আন্দোলন হয়ে ওঠে ঘনীভূত। জাতীয় জীবনে সেই বোধের উদ্বোধন ঘটে। সেই অভিশাপ বোধের বিস্তারই

---

*পিএইচডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যেন যুদ্ধাপরাধী, পরবর্তী পর্যায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। সেজন্য বাংলাদেশের সমাজে যুদ্ধাপরাধ করে কারও বিচার না হলে তা বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করে এবং এভাবে সৃষ্টি হয় কলুষিত সমাজ। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মিত্র পক্ষের প্রধান আইনজীবী জাস্টিস জ্যাকসন বলেছিলেন, 'মানব জাতিকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধপরাধের বিচার প্রয়োজন। এই বিচার না হলে সমাজে সভ্যতার বোধ প্রতিষ্ঠিত হবে না।' মূলত সভ্যতার বোধ সৃষ্টিই মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনের মূল দর্শন।

নবীন গবেষক তপন পালিত গবেষণার বিষয়বস্তুকে ৯টি অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অধ্যায়: 'পূর্ব ধারণা', দ্বিতীয় অধ্যায় : 'মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার দাবি : গোড়ার কথা', তৃতীয় অধ্যায়: 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ', চতুর্থ অধ্যায় : 'গণআদালতের প্রেক্ষাপট', পঞ্চম অধ্যায় : 'গণআদালতের দিন', ষষ্ঠ অধ্যায়: 'গণআদালত পরবর্তী আন্দোলন ও জাতীয় তদন্ত কমিশন', সপ্তম অধ্যায় : 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পুনর্গঠন ও পরবর্তীকালীন আন্দোলন', অস্টম অধ্যায়: 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও আন্দোলনে প্রণোদনা', নবম অধ্যায় : 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু'। এছাড়াও রয়েছে প্রস্তাবনা, উপসংহার, পরিশিষ্ট, তথ্যপঞ্জি, নির্ঘণ্ট ও আলোকচিত্র। এ অধ্যায় বিন্যাসে গবেষক মানবতাবিরোধী আন্দোলনের সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করলেও মুক্তির যে সংগ্রাম তা এখনও চলছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কিছু আদর্শিক প্রশ্নে। সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সেই আদর্শ ও ভাবধারা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে সেই সংগ্রাম বৃথা। এজন্য পাকিস্তানি বাহিনী যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল মুক্তিযুদ্ধের পরপরই তাদের বিচারের দাবি ওঠে। মূলত বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলনটির সূত্রপাত হলেও এর সঙ্গে গণহত্যার বিচারের দাবি মিলে বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয়।

শুধু মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের দাবির কারণেই আন্দোলনটি ব্যাপকতা লাভ করেনি। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই, ১৯৭২ সালের সংবিধানে খচিত ৪ মৌল নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর গত চার দশকে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বেশির ভাগ সময় ক্ষমতায় আরোহন করেছে, তারা সংবিধানের মৌল নীতিতে কুঠারাঘাত করেছে, রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে সেই অপশক্তিকে পুনর্বাসিত করে দেশকে উল্টো দিকে চালিত করেছে। এমনকী মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধীদের ক্ষমতার অংশী করা হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রটিই তারা পাল্টে দিতে চেয়েছে। ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধ আন্দোলনটি একটি নাগরিক আন্দোলন হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির জাতীয় জীবনের আদর্শিক ভবিষ্যত। এজন্য আন্দোলনটি হয়ে ওঠেছে জনগণের আন্দোলন। বলা যায় এ এক নতুন মুক্তিযুদ্ধ।

গবেষক 'প্রস্তাবনা'র প্রথম অংশে আন্দোলনের শুরু ও পরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে চার দশক।

গবেষক লিখেছেন, 'সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনের মাধ্যমে এই বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সুশীল সমাজ এই বিচারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন ও দাবি জানিয়ে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের এই বিচার শহিদ পরিবার ও সুশীল সমাজের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফল।' প্রায় চার দশক ব্যাপী পরিচালিত এই আন্দোলনের ওপর ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ। কিছু বইপত্রও লিখিত হয়েছে। কিন্তু গবেষকের ভাষ্য মতে, 'সেগুলোতে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার সম্পর্কে ১৯৭১-২০১২ সাল পর্যন্ত চলমান আন্দোলনের কোনো ধারাবাহিক চিত্র নেই।' এই অভাব বোধ থেকে তিনি গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেন। এর মাধ্যমে দেশের নানা প্রান্তের, দেশে-বিদেশের আন্দোলনের চিত্রও ওঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায় 'পূর্ব ধারণা'য় এই গবেষণাগ্রন্থে যেসব প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে তার সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হয়েছে। যেমন 'আন্তর্জাতিক অপরাধ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ গণহত্যা, নির্যাতন ও নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যারা দায়ী ছিল তাদের বিচার করার সময় প্রথম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যুদ্ধকালে সংঘটিত যাবতীয় অপরাধ এবং নির্দিষ্ট হয়েছে চরম শাস্তির বিধান। এই অপরাধগুলোকে বলা হয় 'আন্তর্জাতিক অপরাধ'। দেশকাল নির্বিশেষে যার চরিত্র, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন।

এরপর যুদ্ধপরাধ, নূরেমবার্গ ট্রাইবুন্যালের নীতিমালায় আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষত জাতিসংঘ ১৯৪৯ সালের কনভেনশন মতে গণহত্যার সংজ্ঞা তুলে কী করে এগুলিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে উদাহরণ দিয়ে গণহত্যার স্বরূপ তুলে ধরেছেন গবেষক। যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইতিহাস, যুদ্ধের নিয়ম লংঘন ও শাস্তির বিধান, যুদ্ধের ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিধান, অপরাধের দায়তত্ত্ব তুলে ধরে যুদ্ধ ও অপরাধ সংক্রান্ত আইন ও বিধান তুলে ধরে অতীত মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন। প্রাচীন সব ধর্মমতের এ সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও বিধান উপস্থাপন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রেক্ষাপট অংশে সাতচলি-শের দেশভাগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টেনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনের নাম তুলে ধরা হয়েছে। তারপর রয়েছে পাকিস্তানিদের সহযোগী বা দোসর বাহিনী, পাকিস্তানপন্থী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা। রয়েছে স্থানীয়ভাবে গঠিত সহযোগী সংগঠন শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামস, পাকিস্তানিদের সাহায্যকারী রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ব্যক্তি ও সংগঠন কীভাবে ও কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বুঝা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার দাবি : গোড়ার কথা'য় আলোচনা করা হয়েছে আন্দোলনের বীজ সম্পর্কে। মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের দাবি ওঠে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে। তখন বাংলাদেশ সরকার এ বিচারের কথা বলে। তখন শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবার, সুশীল সমাজ এ দাবিতে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল মিটিং করে। ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের

আহ্বান, ২৪ ডিসেম্বর ২০ জন বুদ্ধিজীবীর বাংলাদেশ সরকারের নিকট আহ্বান এবং জহির রায়হানকে আহ্বায়ক করে 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' গঠনের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম ভাষণে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ২৪ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্রুনাল) অর্ডার ১৯৭২' জারি করে। শহিদ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে ১৯৭২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যরা শহিদ মিনারে গণজমায়েত করে। তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের দাবি জানান।

দালাল অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ সারা দেশে দালালদের বিচারের লক্ষ্যে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। মৃত্যুদণ্ড হয় ১৮ জনের। সরকার ৫ এপ্রিল গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠন করে। দালাল আইনের বিপক্ষে দেশে-বিদেশে নানামুখী চাপ সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩' জাতীয় সংসদে পাশ হয়। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা ও আন্তর্জাতিক চাপে ১৯৭৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল যুদ্ধবন্দি ইস্যু। বাংলাদেশ সরকার ৯১,০০০ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের ব্যাপারে জটিলতা উপলব্ধি করে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা নির্ধারণ করে ১৯৫। আইনটি এদের উদ্দেশ্যে প্রণীত হলেও আইনের কোথাও সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এই আইনে কী করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি দেয়ার বিধান ও আপিলের সুযোগ রয়েছে তা গবেষক ব্যাখ্যা করেছেন।

যুদ্ধবন্দি ইস্যুতে পাকিস্তান ১৯৫ জন যুদ্ধপরাধীর মুক্তির ব্যাপারে নানা কৌশল অবলম্বন করে। গবেষক দেখিয়েছেন, পাকিস্তান-ভারত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে বাঙালি, ভারত থেকে পাকিস্তানি বন্দি ও বাংলাদেশ থেকে বিহারি প্রত্যাবসানের ডামাডোলে যুদ্ধপরাধী বিচারের বিষয়টি কিভাবে চাপা পড়ে যায়। (পৃ. ৬৭)।

দেশি-বিদেশি চাপ এবং দেশ পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করার জন্য ৩০ নভেম্বর নির্দিষ্ট ১৮টি অপরাধ, যেমন– খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতির সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তি ছাড়া বাকীদের বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তার প্রতিক্রিয়াও গ্রন্থে এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। ফলে আটককৃত ৩৭ হাজার যুদ্ধাপরাধীর মধ্য থেকে ২৬ হাজার মুক্তি পায় এবং জেলে বন্দি থাকে১১ হাজার। গবেষক স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ক্ষমা করে দিলেও তাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেননি। সংবিধানের ১২ ও ৩৮ ধারার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। সংবিধানের ৬৬ নং অনুচ্ছেদে দন্ডিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দালালদের সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করেন।' এসব না জানার কারণেই বঙ্গবন্ধু-ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা বিষয়ে জনমনে বিভ্রান্তি রয়েছে। অর্থাৎ শুরু থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধের বিচার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতি ওঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ'-এ মূলত জিয়াউর রহমানের শাসনামলে যুদ্ধাপরাধী বিচার আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা লাভ করে দালাল আইন

বাতিল করেন। তখন কারাগারে আটক বাকী ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধীও মুক্তি পেয়ে যায়। জামায়েতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়।

গোলাম আযম ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার উছিলায় পাকিস্তানি পাসপোর্টে ৩ মাসের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে যাননি। এটি সুশীল সমাজকে দারুণভাবে বিক্ষুদ্ধ করে। গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কার ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের দাবিতে লে. কর্ণেল কাজী নূর-উজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে। ১৯৮১ সালের ২১ মার্চ কাজী নূর-উজ্জামান সর্বপ্রথম গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের ঘোষণা প্রদান করেন। তখন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনগুলি গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পটভূমিতে ১৯৮৪ সালে কাজী নূর-উজ্জামানকে সভাপতি এবং লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে সম্পাদক করে গঠিত হয় 'একাত্তরের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র'। কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই প্রকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলনের গতি সঞ্চার ঘটে।

গোলাম আযমসহ ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। জিয়া ক্ষমতায় এসে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠন করে রাষ্ট্রকে উল্টো দিকে ধাবিত করেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ওপর চালান খড়গ। তিনি রাষ্ট্রের সেকুল্যার চরিত্রকে ধর্মীয় সত্তায় রূপান্তর করেন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায্য বিচার' হিসেবে প্রতিস্থাপন করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে করেন কুঠারাঘাত। যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসন শুরু করেন। জামায়াতে ইসলামী তখন পরিস্থিতি অনুকূল ঠাহর করে সদর্পে বলে ওঠে, '১৯৭১ সালে আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি।' তখন তাদের ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘ', যারা মুক্তিযুদ্ধকালে আল-বদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 'সংঘ'-এর বদলে 'শিবির' নামে তাদের নতুনভাবে উদয় ঘটে।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আরোহন করে তার গণবিরোধী চরিত্রের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেন এবং সংবিধানে ললাটিকায় স্থাপন করেন 'বিসমিল-াহির রাহমানির রাহিম'। জিয়া ও এরশাদ দুজনেই মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন করেন। জিয়াউর রহমানের কার্যকলাপের মূল্যায়ন করে গবেষক লিখেছেন, 'জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট ও পাকিস্তানি ধারায় ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেন। পুনর্বাসিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ধর্মীয় রাজনীতির আড়ালে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত।' এখানে রয়েছে আদর্শিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

এই সময়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ ১৯৮৬ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী ১০টি আসন লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি কী করে রাজনীতিতে সরব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, বিস্তার ঘটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এবং তার প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ সংসদ ও নাগরিক সমাজ যে ফুঁসে ওঠে– এসবের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন গবেষক।

চতুর্থ অধ্যায় 'গণআদালতের প্রেক্ষাপট'। জেনারেল এরশাদ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ ও সামরিকায়নের পাশাপাশি শিক্ষানীতির মধ্যে আরবি ও ইংরেজি পড়ানো বাধ্যতামূলক করে জনবিচ্ছিন্নতার পথ তৈরি করেন। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ছাড়াও তার অন্যান্য সাম্প্রদায়িক অপকর্মের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদে উন্মেষ ঘটে কয়েকটি সাংস্কৃতিক প-াটফর্মের। এর মধ্যে রয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট (১৯৮৪), জাতীয় কবিতা পরিষদ (১৯৮৭), স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি (১৯৮৮) ইত্যাদি।

১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতন ঘটে এবং ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে বিএনপি, সেখানে সমর্থকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় জামায়াতে ইসলামী। নির্বাচনে তারা লাভ করেন ১৮টি আসন। ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে জামায়োতে ইসলামীর আমির নির্বাচিত করা হয়। এর প্রতিবাদে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি, ছাত্র সংগঠন রাজপথে মিছিল বের করে। ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি'। ১১ ফেব্রুয়ারি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ৭২টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি', যার আহ্বায়ক মনোনীত হন শহীদজননী জাহানারা ইমাম। মূলত এই সংগঠনটি মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার আন্দোলনকে চড়াইউৎরাইয়ের মধ্য দিয়েও চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

এ আন্দোলনের তুঙ্গ সময় ১৯৯২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ। নির্মূল ও সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ২৫ মার্চের মধ্যে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায়, ঘোষণা দেয়, ২৬ মার্চ প্রকাশ্য গণআদালতে তার বিচার করা হবে। গণআদালতের কর্মসূচিকে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, ছাত্র-যুবা-নারী ও মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন সমর্থন জানায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের মন্তব্য, 'নিমূর্ল কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে গোলাম আযমের বিচারের ইস্যু রাজনীতির প্রধান প্রভাবক হয়ে ওঠে। দল নিরপেক্ষ ব্যাক্তিদের নিয়ে নির্মূল কমিটি গঠিত হলেও কমিটির ঘোষণার সঙ্গে প্রায় সকল বিরোধী দলই একাত্মতা প্রকাশ করে।' (পৃ. ১১৭) সুশীল সমাজের সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সভা-সমাবেশে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে বক্তৃতা করেন। ফলে, গবেষকের মন্তব্য, 'সমন্বয় কমিটি গঠিত হওয়ার পর আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র ও বিস্তৃতি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।' (পৃ. ১২০)

আন্দোলনকে সফল করার জন্য জাহানার ইমাম অসুস্থতা সত্ত্বেও দেশের নানা প্রান্তে সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করেন। গণআদালতের পক্ষে জাতীয় সংসদের ১০০ জন সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। জামায়াতে ইসলামী গণআদালত কর্মসূচি প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্মূল কমিটি এই চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য সমন্বয় কমিটি মৃত্যুঞ্জয় স্কোয়ার্ড গঠন, সুশীল সমাজের গণআদালতের পক্ষে অবস্থান, জামায়াতে ইসলামীর অপপ্রচার, চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জন সদস্য সমেত জাহানারা ইমামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ, গোলাম আযমের পক্ষে কতিপয় আইনজীবীর বিবৃতি, গণআদালতের পক্ষে গণজাগরণ ও প্রস্তুতি প্রভৃতির বিবরণ গবেষক তুলে ধরেছেন ।

পঞ্চম অধ্যায় 'গণআদালতের দিন'। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ছিল গণআদালতের দিন। এদিন প্রথমে গণআদালতের আইনজীবী, বিচারক, অভিযোগকারী, সাক্ষী, শহিদ পরিবার বীরাঙ্গনা সবাই হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েসনের সভাপতির কামরায় আসেন। সেখানে গাজীউল হক সংক্ষিপ্ত ভাষণে গণআদালতের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন এবং গণআদালতের বিচারকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমামের পক্ষে রায় পড়ে শোনান।

সেখান থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের স্থানে স্থাপিত মঞ্চে বিচারক, আইনজীবী, সাক্ষী, অভিযুক্তকারী ও অন্যদের আগমন, বিচার কার্যক্রম, গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমামের রায় ঘোষণা, বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় 'রিলে' পদ্ধতিতে রায় জনসমুদ্রে ছড়িয়ে দেয়া, গোলাম আযমের প্রতি জনমানুষের নানাবিধ ঘৃণা প্রকাশের চিত্র, গণআদালতের মিছিলে বাধা, আক্রমণ ও প্রতিবন্ধতা, রায় সম্পর্কে নানা শ্রেণিপেশার মানুষের অনুভূতি, জাতীয় প্রেসক্লাবে জাহানারা ইমামের প্রেস ব্রিফিং ও সরকারকে এক মাসের মধ্যে জনতা রায় বাস্তবায়নের অনুরোধ, এবং রায় ঘোষণার পর ঢাকার উত্তাল চিত্র এবং ঢাকার বাইরের প্রতিক্রিয়া গবেষক তুলে ধরেছেন থরে থরে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে প্রকাশ্য গণআদালতে গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'গণআদালত পরবর্তী আন্দোলন ও জাতীয় তদন্ত কমিশন'-এর ব্যাপ্তি গণআদালত-পরবর্তী সময় থেকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতায় আরোহনের পূর্ব পর্যন্ত। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গণআদালতের আহ্বায়ক জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। দেশের নানা স্থানে নির্মূল কমিটির সদস্যদের হয়রানি করা হয়। ২৯ মার্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনে তার সভাপতিত্বে ১২টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠকে ২৪ জন বরেণ্য নাগরিকের বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানান। গণআদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য অব্যাহত সভা-সমাবেশ যেমন চলতে থাকে, তেমনি নির্মূল কমিটি ৪ দফা দাবি নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন চলতে থাকে। জাহানারা ইমাম ৪ দফা দাবি সভা-সমাবেশে জনসম্মুখে তুলে ধরেন।

কবি সুফিয়া কামালকে সভাপতি করে ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ গঠিত হয় 'জাতীয় গণতদন্ত কমিশন'। কমিটি ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালের ২৬ মার্চ ৮ জন ও ৭ জন যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম হয়ে পড়ে কিছুটা স্থবির। ফলে দল নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল দালাল নির্মূল কমিটি' পুনর্গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের পর্যবেক্ষণ, 'রাজনৈতিক দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার কারণে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র কার্যক্রমে ভাটা পড়ে।' (পৃ. ২৩৪) কিন্তু নির্মূল কমিটি লক্ষ্য ও আদর্শে ছিল অবিচল। যুদ্ধাপরাধীদের ভোটাধিকার বাতিলের দাবি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা, মোনায়েম খানকে 'শহীদ' বলার প্রতিবাদ, যুদ্ধাপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্রুনালে বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মূল কমিটি আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে নির্মূল কমিটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ট্রাস্ট' গঠন করে দেশব্যাপী শুরু করে

পাঠাগার আন্দোলন। এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য। গবেষক প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তৃতরূপে তুলে ধরেছেন।

সপ্তম অধ্যায় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি পুনর্গঠন ও পরবর্তীকালীন আন্দোলন'। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তারে নানামুখী কর্মপ্রয়াস গড়ে ওঠলে বিচারের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। ২০০১ সালে বিএনপি জামায়েত জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। তখন যুদ্ধাপরাধীরা মন্ত্রী পদেও আসীন হন। কবি শামসুর রাহমানকে সভাপতি করে নির্মূল কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এই আন্দোলনকে দেশের নানা প্রান্তে ও দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় থাকে। ইতোমধ্যে শুরু হয় 'নির্মূল কমিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান'-এর কাজ। এর অংশ হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ট্রাস্ট' ছাড়াও গঠিত হয় 'সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' (২০০১)। এছাড়াও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মেলা, সারাদেশে সভা-সমিতি ও সেমিনারের আয়োজন, যুদ্ধাপরাধ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ ও সংবিধান বিষয়ে গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ।

এছাড়াও রয়েছে 'জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন; মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক' প্রদান। বের হতে থাকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'জাগরণ', বীরাঙ্গনা সংবর্ধনা (২০০২), মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠক, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মতামত, বিবৃত ও সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি।

২০০৭ সালের ১১ জুলাই ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভিন্ন সংগঠন মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তখন সেনাবাহিনী প্রধান মঈন ইউ আহমেদ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের কথা বলেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন পাঠ্যপুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস বাদ দেওয়ার কথা। ফলে আন্দোলনটি পায় নতুন মাত্রা। সেক্টর কমাণ্ডারদের সংগঠন 'সেক্টর কমাণ্ডার ফোরাম', 'নির্মূল কমিটি', প্রজন্ম '৭১সহ অনেক সংগঠন বিচারের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করে। এসবের বিশদ বর্ণনার পাশাপাশি এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঢাকার বাইরে ও বিদেশে নির্মূল কমিটির আন্দোলনের বিস্তার। এর মধ্য দিয়ে গবেষক মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনের তৃণমূলের প্রভাবকেও সমানভাবে স্পর্শ করে গেছেন।

অষ্টম অধ্যায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও আন্দোলনে প্রণোদনা'য় মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনে যেসব সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উপাদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপাদান প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে তা গবেষক তুলে ধরেছেন। এছাড়া নানামুখী সাংস্কৃতিক উদ্যোগের কথা আলোচিত হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবকে দেখানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান জনগণকে উজ্জীবিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে। মনোজগতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্ফূরণের জন্য গণজাগরণ ঘটে– এটি তুলে ধরাই ছিল গবেষকের উদ্দেশ্য।

নবম অধ্যায় 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু'। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় মহাজোট নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং নির্বাচনী

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১০ সালের ২৫ মার্চ ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল, প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা গঠন করেন। এভাবে নির্মূল কমিটির আন্দোলন চলে আসে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে । ট্রাইব্রুনালকে সহযোগিতা করার জন্য নির্মূল কমিটি গঠন করে 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত নাগরিক কমিশন'। নির্মূল কমিটি যেহেতু, গবেষকের পর্যবেক্ষণে, 'দীর্ঘদিন ধরে বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন তাই তাদের পক্ষে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা সম্ভব ছিল। তাই তারা বিভিন্ন বিবৃতি ও চিঠির মাধ্যমে সরকারকে এবং ট্রাইব্যুনালকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা' প্রদান করে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার বানচালের জন্য জামায়াতে ইসলামী দেশে-বিদেশে নানাভাবে অপপ্রচার চালায়। নির্মূল কমিটি প্রতিনিধিবৃন্দ অপপ্রচারের জবাব দেন এবং তুলে ধরেন বিচারের প্রাসঙ্গিকতা। শুরু হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন, বিচারক নিয়োগ, আইনজীবী প্যানেল, তদন্তকারী সংস্থা গঠনের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার। গবেষক এসবের বিস্তৃত ভাষ্য তুলে ধরেছেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনের একটি বিশেষ অধ্যায় 'গণজাগরণ মঞ্চ'। কাদের মোল-ার ফাঁসির দাবিতে ২০১৩ সালের ৫ ফেব্র"য়ারি এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে। প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৭৩ সালের আইন সংশোধন করে রাষ্ট্রপক্ষকে আপিলের সুযোগ দিয়ে বাদী-বিবাদীর আপিলের সমতা বিধান করা হয়। তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের এক ভিন্ন মাত্রা বটে। ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি জামায়েতে ইসলামীর সাবেক রোকন আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ দিয়ে প্রথম রায় ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় রায়ে আবদুল কাদের মোল-াকে প্রথমে যাবজ্জীবন এবং পরবর্তীকালে সরকার পক্ষের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল রায় কার্যকর করে। কাদের মোল-ার ফাঁসির মধ্য দিয়ে ৪০ বছরের মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখে। তপন পালিত এভাবেই তাঁর গবেষণার বিষয়ের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হন।

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি প্রায় চার দশক। এই সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আন্দোলনের সঙ্গে আছড়ে পড়েছে। আন্দোলনটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। তবে তার রয়েছে বহু ভঙ্গিম রূপ। এজন্য গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশ বেশ বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি সংক্রান্ত সংবাদ-সংকলন, 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়' গ্রন্থের ভূমিকাংশ, নির্মূল কমিটির প্রথম ঘোষণা, গণআদালতের রায়, গোলাম আযম ও গণআদালত প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ, 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক'প্রাপ্তদের তালিকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রকাশিত পুস্তিকা ও স্মারক বক্তৃতার তালিকা, গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার চেয়ে জাতীয় সংসদের ১০০ জন সদস্যের ঘোষণার স্কেন কপি ইত্যাদি। এসব তথ্যোপকরণের সংযোজন গ্রন্থটিকে দিয়েছে দালিলিক গুরুত্ব।

'আলোকচিত্র' অংশ মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন সংক্রান্ত ২৪ পৃষ্ঠা ছবি যেন ৬০০ পৃষ্ঠা গ্রন্থের পুরো ইতিহাস বলে দিয়েছে। আলোকচিত্র অংশ শুরু হয়েছে দৈনিক বাংলা পত্রিকার স্কেন কপির মাধ্যমে যেখানে বঙ্গবন্ধু তর্জনি উচিয়ে বলছেন, 'বাংলার মাটিতে

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই', আর যবনিকা ঘটেছে গণআদালতে গোলাম আযমের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর শহীদজননী জাহানারা ইমামের বিজয় সূচক 'ভি' চিহ্ন প্রদর্শনের ছবি দিয়ে। গ্রন্থে যে ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে তারই বিবরণ রয়ে গেছে ছবিতে। ফলে পুরো পাঠ হয়ে ওঠে আনন্দময় ও উপভোগ্য।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে অনুসৃত হয়েছে বর্ণনামূলক পদ্ধতি। সমকালীন পত্র-পত্রিকা, স্মৃতি, গবেষণাগ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, পুস্তিকা, লিফলেট থেকে তথ্যসংগ্রহ করেছেন গবেষক। সাম্প্রতিক ইতিহাস হিসেবে গবেষকের জন্য তথ্য ছিল সুলভ। ব্যাপক তথ্য-উপাত্তের সমারোহে লেখক আটপৌরে ভাষায় বর্ণনা করেছেন আন্দোলনের বাঁক ও পালাবদলের ভাষ্য। সেখানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য পাঠকের কাতরতা অবশ্য থেকেই যায়।

'উপসংহার'-এর অন্তিমাংশে গবেষক লিখেছেন, '১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ পথচলা শুরু করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের দাবিতে পরিচালিত চার দশকের আন্দোলন সত্যিকারের সফলতা লাভ করবে। হাজার বছরের বাঙালি সমাজের উদার, সমন্বয়বাদী ও অসাম্প্রদায়িক সাধনা লাভ করবে বাস্তবরুপ। গড়ে উঠবে সোনার বাংলাদেশ।' এর মধ্যেই রয়েছে তাত্ত্বিক কাঠামোর ইঙ্গিত, যার ওপর দাঁড়িয়ে পরিচালিত হয়েছে পুরো আন্দোলনটি। এখানে প্রত্যাশা জাগে আন্দোলন সম্পর্কে গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও মতামত, এর সবলতা ও দূর্বলতা সম্পর্কে মূল্যায়ন– সর্বোপরি এর দার্শনিক ভিত্তি নিরূপন। যদিও গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গে গবেষক এর ইশারা দিয়েছেন। তবে তা প্রচ্ছন্ন।

গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদর্শিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ ছিল প্রত্যাশিত। কোন ভাবাদর্শে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বিপরীত আদর্শবাদীরাই বা কী চেয়েছিল। মূলত দ্বন্দ্ব ছিল গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সামন্তবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর সরল বিভাজন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। প্রথমটি রস সঞ্চয় করেছিল একুশে ফেব্রুয়ারি, ছয়দফা, পহেলা বৈশাখ, বাঙালি সংস্কৃতি থেকে, অন্যটি সামন্তবাদী, সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা থেকে, যার ভিত্তি ছিল অনেকাংশে মওদুদীবাদ। এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকে ঘটে সংঘাত। যার স্বরূপ ঘটে মুক্তিযুদ্ধে এবং তাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায়।

মূলত উক্ত বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন কীভাবে সাফল্য লাভ করে তারই বৃত্তান্ত আলোচ্য গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের পর চার দশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে নানা সঙ্কট ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। আন্দোলনটি এর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়। গবেষক সযত্নে সেই বৈরী শক্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যে, এ আন্দোলনকে পিছিয়ে দিতে, নিশ্চিহ্ন করতে, কখনোবা সমূলে উৎপাটন করতে কী অপচেষ্টা করা হয়েছিল। সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলন হয়েও এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ওপরই আন্দোলনটি দাঁড়িয়েছিল। গবেষককে প্রতিনিয়ত লক্ষ রাখতে হয়েছে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর। এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয়েছে আন্দোলনের স্রোতধারা। তাছাড়া আন্দোলনটি বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভূমিকা গ্রহণ

করেছিল, তাদের গঠন ও কার্যক্রম তুলে ধরে গবেষক দেখিয়েছেন কী করে জনমনে বিচারের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। গবেষকের বড় কৃতিত্ব পূর্বাপর ঘটনাধারা তুলে ধরে আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রণয়ন।

নবীন গবেষক তপন পালিত একটি ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন করলেন। যে মূল্যবোধ থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সম্পন্ন হয়েছে, সেই সঙ্কট আজও সমাজে বিরাজমান। এই সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে পারলেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ তথা উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হবে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি কাজ করবে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। অন্যায়ের কোনো বিচার না হলে সমাজ যে খুনিদের সমাজ হয়ে ওঠে এখান থেকে বের হতে পেরেছে বাংলাদেশ। বইটি মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যাপ্তি ও বিকাশ জানতে– সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হবে অপরিমেয় সহায়ক। কবি শামসুর রাহমান কবিতায় গণহত্যা-নির্যাতনকারীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। কেন এই অভিশাপ, অভিশাপের পরিণতিইবা কী– তার বিস্তৃত বয়ান বর্তমান গ্রন্থ। গবেষককে আন্তরিক অভিনন্দন।